ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৫ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪২৫

প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা: একটি পর্যালোচনা

*ড. মো: মনজুর কাদির

সারসংক্ষেপ: উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার পূর্বে বাংলা তথা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন একটি নিজস্ব শিক্ষাধারা প্রচলিত ছিল। ভারতে প্রাচীন ও মধ্যযুগে যে ব্যাপকভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল তা হিন্দু, মুসলিম ও বৌদ্ধ ধর্মের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। শিক্ষা ছিল গুরুগৃহ, টোল, চতুষ্পাঠী, মক্তব, ইমামবাড়া ও মাদ্রাসাকেন্দ্রিক। এ শিক্ষা দেশের মানুষের ধর্ম, রীতিনীতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজ ব্যবস্থা, আবহাওয়া ও মানুষের চাহিদা অনুযায়ী গড়ে উঠেছিল। আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ দেশের মাটিতে দেশীয় লোক দ্বারা এ শিক্ষা পরিচালিত ও লালিত হতো। মোঘল শাসনের অবসানের পর এমন কি ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পরও দীর্ঘদিন ধরে এ শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে চালু ছিল। এ শিক্ষা দেশীয় শিক্ষা নামে অভিহিত হতো। দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এ দেশের রাজা-বাদশাহ, ধনী ব্যক্তি, সমাজসেবী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের অর্থানুকূল্যে ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো।[১] এই প্রবন্ধে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রাচীন যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং মধ্য যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা নামে দুটি কালপর্বে ভাগ করে তৎকালীন শিক্ষা-ব্যবস্থার স্বরূপ সন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাচীন যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রাচীন যুগে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ইতিহাসকে ধরে রাখার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। ফলে এ যুগে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সঠিক তথ্য আহরণ সম্ভব হয়নি। তবে যতটুকু জানা যায়, তার ওপর ভিত্তি করে রচিত ইতিহাস আমাদের কাছে যে তথ্য উপস্থাপন করে তা থেকে প্রাচীন যুগের শিক্ষাচিত্রের একটা রূপ উপস্থাপন করা যায়।

আর্য যুগের প্রথম দিকে ভারত উপমহাদেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা নামে অভিহিত হতো। এ ব্যবস্থায় হিন্দু সমাজে শুধু ব্রাহ্মণদের মধ্যে শিক্ষাকার্য সীমাবদ্ধ ছিল। ধীরে ধীরে আর্য সমাজ নানারূপ বৃত্তিমূলক কাজে বিভক্ত হয়ে যায় এবং কালক্রমে গোঁড়া ধর্মীয় শ্রেণিতে রূপান্তরিত হয়। যথা- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। শূদ্র শ্রেণিতে দেশের অনার্য আদি অধিবাসীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।

আর্য যুগে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণ শিশুদের পুরোহিত করে গড়ে তোলা। খ্রিঃপূঃ ৫০০ অব্দের কাছাকাছি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শিশুরা ব্রাহ্মণ শিক্ষকদের কাছে তাদের নিজ নিজ পেশার উপযোগী শিক্ষালাভ করতে শুরু করে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই রূপান্তরের ফলস্বরূপ পরিষদ, টোল, পাঠশালা নামে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। পাঠশালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ করত এবং দেশের আদিম অধিবাসী ও শূদ্র সম্প্রদায় ছাড়া পাঠশালার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

সে-যুগে বাংলাদেশের প্রতিটি বড় বড় গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু ছিল। তবে এখনকার মত দালান-কোঠা বা টিনের চালাঘর তৈরি করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ চালানোর

* সহযোগী অধ্যাপক (অব:), ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

ব্যবস্থা চালু ছিল না। গাছতলায়, মন্দিরে, বাড়ির প্রাঙ্গণে অথবা অতিথিশালায় এসব স্কুল বসতো। খুব বেশি হলে প্রতিটি স্কুলে কুড়ি জন ছাত্র থাকত। স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে একজন শিক্ষক একটি স্কুলে শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকতেন। তিনি ছেলেমেয়েরদকে লেখাপড়া ও পৌরাণিক ইতিবৃত্ত শিক্ষাদান করতেন। এছাড়া গ্রামে দেব-দেবীর পূজা-অর্চনায় প্রধান ভূমিকা পালন করা শিক্ষকের অন্যতম কাজ ছিল। শিক্ষকের নির্দিষ্ট কোন বেতন ছিল না। তাকে তার কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে নিষ্কর জমি অথবা ফসলের কিছু অংশ দেয়া হতো।

আর্য যুগে শিক্ষার উদ্দেশ্য অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট পণ্ডিত বিশেষত জ্যোতির্বিদ ও গণিতশাস্ত্রবিদের উদ্ভব হয়েছিল। শূন্যের ধারণা এ যুগের পণ্ডিতদের কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। এ যুগের পণ্ডিতদের শূন্যের ধারণার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী সময়ে আরবীয় ও ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ গণিতশাস্ত্রকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।[২]

পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। বৌদ্ধ মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা। বৌদ্ধ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল সঙ্ঘারাম। সঙ্ঘারামগুলো বৌদ্ধবিহার হিসেবেও খ্যাত ছিল। এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। এর ফলে সঙ্ঘারামগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় এবং এগুলো বৃহৎ আকারের শিক্ষায়তনে পরিণত হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূচনা উল্লিখিত সঙ্ঘারামজাতীয় বৃহদাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। এ দেশে জনশিক্ষা বিস্তারে বৌদ্ধরাই প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। সম্রাট অশোক প্রজাসাধারণের কল্যাণে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে জনশিক্ষা বিস্তারের জন্য অভিনব পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি ধর্মাচারণ ও মানবীয় কল্যাণমূলক উপদেশমালা পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ করেছিলেন। এছাড়া শিক্ষাবিষয়ক স্তম্ভলিপিতেও তিনি নানা অনুশাসন খোদিত করে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। এভাবে তাঁর শাসনামলে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য বৌদ্ধমঠ প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো।

বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ে প্রাকৃত ছিল জনশিক্ষার মাধ্যম। তবে সংস্কৃত, পালি, আঞ্চলিক ভাষা ও ধর্ম শিক্ষাও শিক্ষার্থীদের শেখানো হত। বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের সাথে সাথে শিক্ষাসূচিতে পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। বৈদিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত কিছু কিছু বিষয়ও বৌদ্ধবিহারে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

উচ্চ শিক্ষার প্রসারে বৌদ্ধরাই প্রথম এ উপমহাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বৌদ্ধ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত উচ্চশিক্ষার পাদপীঠ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজও আমাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সমৃদ্ধ উৎস হিসেবে পরিচিত।[৩]

প্রাচীন ভারতের শিক্ষায়তনগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গৌরব ও ঐতিহ্যের অধিকারী হয়ে আছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, এমন কি চীন, কোরিয়া, তিব্বত, সিংহল প্রভৃতি দেশ থেকেও শিক্ষার্থীগণ উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় করত। কালক্রমে নালন্দা একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ভারতের বিহার রাজ্যের পাটনা শহরের ৪০ মাইল দূরে বড়গাঁও নামক গ্রামে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছিল। খনন কার্যের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের যে সুবিশাল সৌধ, জলাশয় ও শ্রেণি কক্ষের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধির পরিচয় মেলে।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত ছিল। তবে এখানে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রচলন ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া একটি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় বহন করত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো ছিল-চতুর্বেদ, হীনযানশাস্ত্র, মহাযানশাস্ত্র, অষ্টাদশ শাখার তত্ত্বসমূহ, ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, রসায়নশাস্ত্র, যাদুবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, ব্যবহারিক শাস্ত্র, শিল্পবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, তান্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্র প্রভৃতি।

প্রাচীন ভারতে নালন্দার পর পরই খ্যাতির অধিকারী হচ্ছে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাচীন মগধের নিকটবর্তী গঙ্গার তীরে এটি অবস্থিত ছিল। পাল বংশের রাজা ধর্মপাল ছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পঠন ও অনুশীলন প্রাধান্য পেলেও এখানে ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র, যাদুবিদ্যা, গণিত ও জ্যোতিষবিদ্যার চর্চা হত। এখানে পরীক্ষা পদ্ধতি ছিল মৌখিক। বিক্রমশীলার অধ্যাপকদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিলাভ করেছিলেন অতীশ দীপাংকর। তিনি ছিলেন ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অধিবাসী।

বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ বাংলাদেশেও প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালের যে লিপিগুলি উদ্ধার করা হয়েছে তা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, পাল বংশ প্রতিষ্ঠার সহস্রাধিক বছর পূর্ব থেকে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যবিদ্যা ও সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা প্রচলিত ছিল। হিউয়েন সাং-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সেকালে বাংলাদেশে ছোটবড় বহু বৌদ্ধবিহার গড়ে উঠেছিল এবং ঐ প্রতিষ্ঠানগুলোতে বৌদ্ধধর্ম ও বিদ্যাচর্চার সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাও সযত্নে লালিত হত।

এ সকল বৌদ্ধ বিহারের মধ্যে মহাস্থানগড়ের সন্নিকটে অবস্থিত ভাসু বিহারের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও এ যুগের সর্ববৃহৎ বৌদ্ধবিহার ছিল বৃহত্তর রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত। খ্রিস্টিয় অষ্টম শতকে পাল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপাল ১৭৭ কক্ষ বিশিষ্ট এই সুবৃহৎ বিহারটি নির্মাণ করেন।[৪] পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার সমগ্র বৌদ্ধ জগতে সোমপুর মহাবিহার নামে সুপরিচিত ছিল।

প্রাচীন যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা প্রসারে উপরিল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা ছিল অনন্য। এসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চেয়ে কোনভাবেই হীন মানের ছিল না। এ সকল বিদ্যাপীঠে হাজার হাজার ছাত্র ও শিক্ষক একসংগে বসবাস করে জ্ঞানচর্চা করতেন।

ঐতিহাসিক তথ্যের স্বল্পতা সত্ত্বেও আমাদের জানতে অসুবিধা হয় না যে, সুদূর অতীতে শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি বাঙালিদের অনুরাগ ছিল অকৃত্রিম। দশ-এগার শতকের প্রশস্তিমূলক লিপিমালাগুলোতে সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা-দীক্ষার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, তর্ক, মীমাংসা, বেদান্ত, প্রমাণ, শ্রুতি, পুরাণ, কাব্য ইত্যাদি তাদের অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন যুগে চার বেদেরই অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হত। এসব বিদ্যাচর্চা কেবল পণ্ডিত ও বিদ্বজ্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। মন্ত্রী, সেনানায়ক প্রভৃতি রাজপুরুষগণও এ সকল শাস্ত্রের অনুশীলন করতেন।

সুতরাং আদিকালে বাংলাদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার যে খণ্ডিত চিত্র আমরা পাই তা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলার পার্শ্ববর্তী প্রদেশ বিহারে অবস্থিত নালন্দা ও বিক্রমশীলার সাথে এ ভূখণ্ডের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এই উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্রগুলো একদিকে বাংলাদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল, অপরদিকে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের পৃষ্ঠপোষকতায় উল্লিখিত শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এই বক্তব্যের সমর্থন নীহার রঞ্জন রায়ের উক্তিতে পাওয়া যায় "নালন্দা মহাবিহারের সঙ্গেও ষষ্ঠ-সপ্তম শতকীয় বাঙ্গালার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং বাঙ্গালার শিক্ষার্থী, আচার্য ও রাজবংশ নালন্দা মহাবিহারের সংবর্ধনের জন্য যে প্রয়াস করিয়াছেন তাহা তুচ্ছ করিবার মত নয়।"[৫] বিক্রমশীলার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা ধর্মপাল এবং বাঙ্গালি শীলভদ্র ও অতীশ দিপাংকর ছিলেন যথাক্রমে নালন্দা ও বিক্রমশীলার মহা-আচার্য। আলোকসম প্রতিভার অধিকারী এ সকল পণ্ডিত যাঁদের খ্যাতি মহাকালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে আজও দেদীপ্যমান।

এছাড়া এ কালের আরও যে সকল বিদ্বান ব্যক্তির নাম আমরা পাই, তাঁদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন ব্যাকরণবিশারদ চন্দ্রগোমী। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, অতি প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশ ব্যাকরণ চর্চায় প্রসিদ্ধি লাভ করে আসছে। যাঁদের অবদানের জন্য বাংলাদেশের এই সুখ্যাতি, চন্দ্রগোমী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। 'চান্দ্র ব্যাকরণ' ও 'টীকা' চন্দ্রগোমীর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এককালে কাশ্মির, নেপাল, তিব্বত ও সিংহলে এই ব্যাকরণ পঠিত হতো। ব্যাকরণ ছাড়াও তিনি সাহিত্য, জ্যোতিষ, তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা এবং অপরাপর কলাবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

দর্শনশাস্ত্রে সে যুগে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন পণ্ডিত গৌড়পাদ। গৌড়পাদ 'সাংখ্য কারিকা' নামে একটি কারিকা রচনা করেন যা, প্রখ্যাত মনীষী আল-বেরুণীর হস্তগত হয়। রসায়ন ও ধাতুর ওপর গবেষণা করে সে যুগে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন নাগার্জুন। তাঁর অন্যতম সহযোগী ছিলেন নাগবোধি। এছাড়া প্রাচীন ইতিহাসে জেতারী নামে একজন বৌদ্ধ আচার্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি ছিলেন বিক্রমশীলা মহাবিহারের একজন খ্যাতনামা আচার্য এবং অতীশ দীপাংকরের গুরু। তিনি দশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের অধিবাসী।

সংখ্যায় নিতান্ত কম হলেও উপরিল্লিখিত কয়েকজন পণ্ডিত ও তাঁদের কীর্তি সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত বহন করে যে, প্রাচীন যুগে বাংলাদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা অতি উচ্চমানের ও বৈচিত্র্যপূর্ণ

ছিল। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই জ্ঞান-সাধনা গুটি কতক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। উল্লিখিত পণ্ডিতদের মহৎ কীর্তির পশ্চাতে ছিল যুগ যুগ ব্যাপী ছোট-বড় নাম না জানা বহু বিদ্যার্থী ও বিদ্বজ্জনের নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান-সাধনার এক গৌরবময় ঐতিহ্য।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রকোপে এককালে বৌদ্ধভিক্ষু ও শ্রমণগণ যেমন তাঁদের বিহারের নিভৃত কক্ষে নীরব জ্ঞান সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন, তেমনি চরম দারিদ্র্য ও অশান্তির মধ্যেও সেকালে মানুষ বিদ্যাচর্চায় কোন অবহেলা প্রদর্শন করেনি। শিক্ষা-দীক্ষার এরূপ ঐতিহ্যের ফলস্বরূপ বাংলাদেশে বহু যুগে বহু মনীষী আবির্ভূত হয়েছেন। জ্ঞানচর্চার এমন অত্যুজ্জ্বল ঐতিহ্য ভারতবর্ষের বাংলা ভূমির বিদ্বৎসমাজের এক পরম সম্পদ।

মধ্যযুগের শিক্ষা ব্যবস্থা

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন ভাষা, শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে। রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে, তারা এ উপমহাদেশে তাদের শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারাও নিয়ে আসে। প্রখ্যাত গ্রন্থকার এন.এন.ল মন্তব্য করেন, মুসলমানদের ভারত আক্রমণ কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল না, শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এটা যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে[৬]।

ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে এদেশের রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়। পূর্বদিকে বহির্বিশ্বের সিংহল, ব্রহ্মদেশ, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দূর প্রাচ্যের দেশের সাথে বাংলার পরিচয় ঘটে। মুসলিম বিজয়ের পর বাঙালি সমাজের সম্মুখে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার দ্বারও উন্মুক্ত হয়। এভাবে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক পরিচয়ের গণ্ডি প্রভূত পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়।

খ্রিস্টিয় সপ্তম-অষ্টম শতকে সমুদ্রপথে আগত কতিপয় বণিক ও ইসলাম প্রচারকের কল্যাণে মুসলিম জগতের সাথে বাংলাদেশের পরিচয় ঘটেছিল। কিন্তু তার প্রভাব ছিল নিতান্তই সীমাবদ্ধ। আসলে তুর্কি বিজয়ের পর থেকে এই সম্পর্ক ব্যাপক ও গভীর হয়।

লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ের পর বাংলার রাজধানী নদীয়া থেকে প্রাচীন শহর গৌড়ে স্থানান্তরিত হয়। ধীরে ধীরে গৌড়ের রাজদরবার বাঙালি সংস্কৃতির লালনক্ষেত্রে পরিণত হয়। দিল্লীর মাধ্যমে ভারত সীমান্তের বাইরে অবস্থিত মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে বাঙালির পরিচয় বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ত্রয়োদশ শতকে মোঙ্গল আক্রমণের ফলে মুসলিম জগত ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বোখারা, সমরকন্দ, বাগদাদ প্রভৃতি মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলো বিধ্বস্ত হয়। তখন অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি, পণ্ডিত, ফকির, কবি, স্থপতি, ভাস্কর, চিত্রকর ইত্যাদি দলে দলে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ভারতে আগমন করেন। এ সকল গুণীব্যক্তির সমাবেশের ফলে দিল্লী শিল্পকলা ও জ্ঞানচর্চার এক প্রসিদ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাঁদের অনেকে বাংলাদেশে চলে আসেন; কারণ বাংলার মুসলমান সুলতানগণ এই সকল জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সাদর

আমন্ত্রণ জানান এবং অর্থ ও সম্মান দিয়ে দেশের নানা স্থানে তাদের প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে বাংলাদেশে বিদেশী মুসলমানদের আগমনের ধারা অব্যাহত থাকে। পরবর্তীকালে দিল্লীতে তুর্কি রাজপরিবারের নানা উত্থান-পতনের ফলে অভিজাত সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক ব্যক্তি বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেন। পনের শতকে অনেক হাবসি খোজাও বাংলাদেশে চলে আসে এবং ষোল শতকে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর বহু প্রধান অধিনায়ক দিল্লী ত্যাগ করে এদেশে বসতি স্থাপন করেন।

এ সকল বহিরাগত মুসলমানদের প্রভাবে বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিম সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে ধর্মপ্রচারে কিংবা মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষা বিস্তারে সুফি সম্প্রদায়ের অবদান সর্বাধিক। তের শতক থেকে পনের শতক পর্যন্ত বাংলাদেশ তথা ভারতে অগণিত সুফি, পীর, দরবেশ, সাধু-সন্ত আগমন করেন। ভারতে যে-সকল সুফি, সাধক-সন্ত বা গোষ্ঠী সক্রিয় ছিল তাদের মধ্যে সোহরাওয়ার্দী, চিশতিয়া এবং কাদেরিয়া সিলসিলা সমধিক পরিচিত। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে ও মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতি বিকাশে সোহরাওয়ার্দি সিলসিলার সুফিদের অবদান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

এভাবে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে মুসলমান শাসনকর্তাগণ, আমীর-ওমরাহ্, রাজকর্মচারী, ওলামা ও সুফি-সাধকগণ শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। তারা প্রায় সকলেই কোন না কোন মাদ্রাসা, বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বহিরাগত এ সকল মুসলমান শাসক ও সুফি দরবেশদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বাংলার সম্ভ্রান্ত ও দানশীল ব্যক্তিরাও শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ফলে, শহরে এবং প্রধান প্রধান স্থানসমূহে বহু সংখ্যক মাদ্রাসা, শিক্ষাকেন্দ্র ও বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, মুসলমানগণ বাংলা তথা এ উপমহাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্বজনীনতা ও উদারতার আদর্শ তুলে ধরেন। তারা সকল মানুষের নিকট এমন কি ব্রাহ্মণদের দ্বারা উপেক্ষিত নিম্ন শ্রেণির হিন্দুদের নিকটও শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন।

মধ্যযুগে প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলাদেশে মুসলিম শাসনামলে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এর কারণ হলো মুসলমানরা তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে শিক্ষা দেয়া ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন। এছাড়া শিক্ষাকে তারা সামাজিক সম্মান হিসাবেও গণ্য করতেন। ফলে সমাজের অবস্থাপন্ন মুসলমানগণ ধর্মীয় ও সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করতেন।

মুসলমান ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা শুরু হতো মক্তবে। এসব মক্তব প্রতিটি মসজিদ এবং এমনকি ধনী ব্যক্তিদের বাড়ি সংলগ্ন ছিল। ফলে, প্রত্যেক শহর, এমনকি গ্রামেও প্রাথমিক বিদ্যালয় বিদ্যমান ছিল। প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য ইমামই ছিলেন শিক্ষক। তিনি ছেলে-মেয়েদেরকে কোরআন পাঠ ও ধর্মীয় মূলনীতিসমূহ শিক্ষা দিতেন। ধর্মীয় শিক্ষাদানই ছিল প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি।

সাধারণত পাঁচ বৎসর বয়সে মুসলমান বালক-বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হতো অবশ্য উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে চার বৎসর চার মাস চার দিন বয়সে

ছেলেমেয়েদের শিক্ষা শুরু করার সাধারণ রীতি প্রচলিত ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুদের এই আনুষ্ঠানিক প্রবেশ 'বিসমিল্লাহ-খানি' অনুষ্ঠান নামে পরিচিতি ছিল। বাংলাসহ সমগ্র মুসলিম ভারতে এই অনুষ্ঠান পালন করা হত।[৭]

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদেরকে আরবি, ফারসি ও বাংলা-এই তিনটি ভাষা শিক্ষা করতে হতো। কোরআন ও হাদিস শিক্ষার জন্য আরবি ভাষা শেখা একান্ত প্রয়োজন ছিল। সমগ্র মুসলমান শাসন আমলে ফারসি ছিল রাজদরবারের ভাষা ও শিক্ষার বাহন। সুতরাং রাজ সরকারে অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি লাভের জন্য ফারসি ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলন অত্যাবশ্যক ছিল। বাংলা ছিল বহু মুসলমান ও অমুসলমানদের মাতৃভাষা। ফলে বাঙালি মুসলমানগণ বাংলা ভাষা শিক্ষাকে অবহেলা করতে পারেনি। বাস্তবিকই বাংলা ভাষা বাংলার মুসলমানদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কার্যত মুসলমান শাসকবর্গই বাংলা ভাষাকে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী বাংলাদেশে বসবাসকারী বহু বাস্তুত্যাগী মুসলমান এই দেশকে তাদের নিজস্ব দেশ এবং বাংলাকে তাদের নিজস্ব ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেন। মুসলমান শাসকগণ বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য পৃষ্ঠপোষকতা এবং উৎসাহ প্রদান করেন। ফলশ্রুতিতে বহু মুসলমান কবি বাংলা ভাষায় তাদের গ্রন্থাদি রচনা করেন। *শমসের গাজীর পুথি*সহ বিভিন্ন বাংলা কাব্যগ্রন্থ এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করে।[৮]

সম্রাট আকবরের শিক্ষাবিষয়ক নিয়ম-কানুন সে কালের বাংলা ও ভারতের অপরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে। সম্রাট আকবর একটি নতুন পাঠ্য পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রয়াস পান, যার ফলে একটি বালক মাত্র দুদিনে অক্ষর পরিচয়, সপ্তাহে শব্দ ও অতঃপর অল্প সময়ের মধ্যে কবিতা পাঠ করতে ও বুঝতে সমর্থ হয়। সম্রাট আশা করেন, যদি শিক্ষার এ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়, তাহলে একটি বালক এক মাস কিংবা এক দিনে যা শিখবে অন্যদের তাতে বহু বছর সময় লাগবে এবং লোকে এই সহজ পদ্ধতি দেখে আশ্চর্যবোধ করবে।[৯] এভাবে বাংলাদেশে প্রাথমিক পাঠ্য-তালিকা আরবি, ফারসি ও বাংলা এবং ধর্ম, নীতিমালা, গদ্য-পদ্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গঠিত ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় ছিল অঙ্কশাস্ত্র। অঙ্কের মৌলিক উপাদানগুলো, যেমন যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ এবং কাঠাকিয়া, গণ্ডাকিয়া, কড়াকিয়া ও বিঘাকিয়া ইত্যাদি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা দেয়া হতো। শুভঙ্কর নামে খ্যাত হিন্দু অঙ্কশাস্ত্রবিশারদ সপ্তদশ শতকের শেষপাদে অথবা অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। শিক্ষার ওপর উইলিয়ম এডাম এর দ্বিতীয় প্রতিবেদনে থেকে জানা যায়, বিদ্যালয়গুলোতে অন্য আর একটি মাত্র লিখিত রচনা ব্যবহৃত হতো এবং তা ছিল ছন্দোবদ্ধ পদ্ধতিতে শুভঙ্করের অঙ্কশাস্ত্রের সূত্রগুলো। মুসলমানদের শিক্ষা ছিল মুগল ভারতের উন্নততর শিক্ষা-সংস্কৃতি অধিক পরিমাণে এই উত্তম শিক্ষা পদ্ধতিরই ফলশ্রুতি।

মুসলিম আমলে প্রাথমিক শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য দিক এই যে, হিন্দু বালকেরা বিশেষত যারা কায়স্থ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল তারা মৌলভিদের পরিচালনাধীন মক্তবগুলোতে শিক্ষালাভ করত। ফারসি ছিল রাজভাষা এবং হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় রাজ-সরকারে চাকরি

পাওয়ার আশা করতেন। প্রয়োজন বিধায় এ শ্রেণির হিন্দুরা ফারসি শিখতেন এবং তাদের সন্তানসন্ততিদেরকেও ফারসি শিক্ষা দিতেন। বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের প্রারম্ভকাল থেকে উচ্চ শ্রেণির বহু সংখ্যক হিন্দুকে মুসলিম রাষ্ট্রের বিভিন্ন চাকরিক্ষেত্রে দেখা যায়। রাজস্ব বিভাগের কাজ প্রায় কায়স্থদের দ্বারা পরিচালিত হতো। এসব হিন্দুরা অবশ্যই ফারসি ভাষা শিখে থাকবেন, অন্যথায় তাদেরকে রাজ-সরকারে চাকরিতে নিয়োগ করা সম্ভব ছিল না। এমনকি অষ্টাদশ শতকেও শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন হিন্দু পরিবারগুলো ফারসি জ্ঞান ব্যতিরেকে শিক্ষাকে অসম্পূর্ণ ও নিরর্থক মনে করতেন। বুকাননের লেখায় এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হিন্দু বালকদের শিক্ষা শুরু করার সময় মুসলমানদের মতো কায়স্থগণও 'বিসমিল্লাহ-খানি' অনুষ্ঠান পালন করতো। পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট মৌলভির দ্বারা এই অনুষ্ঠান পরিচালিত হতো এবং দাওয়াত পত্র ফারসিতে লেখা হতো। এই উপমহাদেশ ভাগ হওয়ার সময় পর্যন্তও উত্তর ভারতে উক্ত নিয়ম প্রচলিত ছিল।[১০]

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে উইলিয়ম এডাম মুসলিম আমলের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা উল্লেখ করেন। তিনি এতে বলেন যে, বাংলা ও বিহারে একলক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। এ দুটো প্রদেশের লোকসংখ্যা ধরা হয় চার কোটি। ফলে বিদ্যালয়ে পড়তে যাওয়া তিন শতেরও অধিক ৫ থেকে ১২ বছর বয়সের বালক-বালিকা একটি গ্রাম্য স্কুলে পড়তে পারে। তিনি মন্তব্য করেন যে, যদিও এই হিসাব অনিশ্চিত পরিসংখ্যানের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তথাপি এগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাম্য বিদ্যালয় থাকার রীতি ব্যাপক হারে বিদ্যমান ছিল এমনকি গরিব শ্রেণির পিতামাতার মনেও তাদের ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষাদানের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত নিবিড় ছিল।[১১] উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মুসলমানরা মক্তব ও মাদ্রাসাগুলোতে ফারসি ও আরবিতে শিক্ষাদানের পুরানো রীতিই বজায় রেখেছিলেন।

মধ্যযুগে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা

মাদ্রাসাসমূহে মাধ্যমিক শিক্ষা দান করা হতো। উৎকীর্ণলিপি ও দলিল-পত্রাদিতে কিছু সংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। সমসাময়িক ইতিহাস লেখকগণ উলেমা ও শেখদের প্রতি শাসক ও অভিজাত আমির-ওমরার পৃষ্ঠপোষকতা ও বাংলায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ প্রদেশে বহু সংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বেশির ভাগ শহর ও গুরুত্বপূর্ণ মুসলমান এলাকাসমূহে মুসলমান অধিবাসীদের শিক্ষাগত প্রয়োজন মেটাবার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল। বহু মসজিদ ও ইমামবাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল।

বাংলার নবাব ও সুবাদারদের শাসনামলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। সে যুগে উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুবাদার, নবাব, অভিজাত শ্রেণি, রাজকর্মচারীবৃন্দ ও মনসবদারগণ সকলেই সুশিক্ষিত ছিলেন। এ যুগে বহু পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়, জ্ঞানের নানা শাখায় এদের বুৎপত্তি ছিল। তারা ফার্সি, আরবি, বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিরাট সংখ্যক

পুস্তক রচনা করেন। মুসলমানগণ ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ব্যাপারে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। উন্নততর জ্ঞানান্বেষণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্যও তাদের ছিল। শাসকবর্গ ও সচ্ছল অবস্থাপন্ন মুসলমানরা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লাখেরাজ, মাদাদ-ই-মাশ, বৃত্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন।

ব্রিটিশ সরকারের লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির বিবরণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে মুসলমান শাসনামলে, ধর্মীয় ও শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মপ্রাণ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের জন্য অসংখ্য নিষ্কর জমির ব্যবস্থা ছিল। এসব ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, মাধ্যমিক শিক্ষারব্যাপক বিস্তৃতি ছিল এবং সমাজে উচ্চশিক্ষারও গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। ফলে আবুল ফজল যথার্থই দাবি করতে পেরেছিলেন, "তরুণদের শিক্ষার নিমিত্ত সকল সভ্য জাতিরই বিদ্যালয় রয়েছে, কিন্তু হিন্দুস্থান -এর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।[১২] মসজিদ ও ইমামবাড়াগুলোতেও মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। মুসলমান আমলে উপমহাদেশে শিক্ষার অবস্থা উল্লেখ করে, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষা প্রতিবেদনে জানা যায়, এরকম একটি মাদ্রাসা কিংবা ইমামবাড়া ছিল না যেখানে আরবি ও ফার্সির অধ্যাপকদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো না।

কোরআন, হাদিস, ধর্মতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র, ইতিহাস এবং অন্যান্য ইসলামী বিষয়াদি মাধ্যমিক পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। লোকায়ত সাধারণ বিজ্ঞান, যেমন-যুক্তিবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি এবং অন্যান্য বিষয়ও মাদ্রাসায় পড়ানো হতো। পাঠ্য-তালিকার কথা বলতে গিয়ে আবুল ফজল লিখেছেন "প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই নীতিশাস্ত্র, গণিত, কৃষি পরিমাপশাস্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতিষশাস্ত্র, চরিত্র-নির্ণয়বিদ্যা, গার্হস্থ্যবিদ্যা, সরকারি আইন-কানুন, চিকিৎসাবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, উচ্চতর অঙ্কশাস্ত্র, বিজ্ঞানসমূহ, ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ করা উচিত। এসবগুলোর প্রত্যেকটি বিষয়ই ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করা যেতে পারে"।[১৩] আবুল ফজলের বক্তব্য দৃষ্টে মনে হয় যে, ঐ সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ সমস্ত বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়া এবং ছাত্রদেরকে পাঠ্য বিষয় নির্বাচনের সুযোগ দেয়া হতো। একজন ছাত্রকে উপরিউক্ত সবগুলো বিষয়ই পড়তে হতো না; বরং নির্বাচিত কয়েকটি বিষয় তাকে পড়ানো হতো। শিক্ষাক্ষেত্রে সম্রাট আকবরের একটি উচ্চাভিলাষী কর্মসূচি ছিল। তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার পাঠ্যবিষয়কে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করতে মনস্থ করেছিলেন, যাতে প্রত্যেকটি শিক্ষিত যুবক মৌখিক ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রে সকল বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, আবুল ফজল সম্রাট আকবরের মতামতই প্রকাশ করেছেন যে, প্রত্যেক ছাত্রেরই উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা করা উচিত।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মতো একজন গোঁড়া মুসলমান শাসকও ধর্মীয় বিদ্যার পাশাপাশি লৌকিক বিষয়গুলো শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দান করতেন। ফরাসি পর্যটক বার্ণিয়ার এই সম্রাটের কথিত গৃহশিক্ষক মুল্লা সলিহর সঙ্গে সম্রাটের একটি চমকপ্রদ আলোচনার কথা বর্ণনা করেছেন। এতে সম্রাট ইতিহাস, রাজনীতি, দর্শন, ভূগোল ব্যবহারিক বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়সমূহে যুবকদের শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন যাতে সে বাস্তব জীবনে প্রবেশ করে সমস্যাদি উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। বর্ণিয়ারের বক্তব্যে

সম্রাট আওরঙ্গজেবের চিন্তাধারার যে প্রতিফলন ঘটেছে, তাতে দেখা যায়- তিনি শিক্ষার বিস্তৃত পদ্ধতিকে অত্যন্ত মূল্য দিতেন যাতে ধর্মীয় ও লৌকিক বিজ্ঞানে যুবকগণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় এবং তার জীবনগঠনে মৌখিক ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রে তাকে সুসজ্জিত করে তোলে।

প্রথম যুগের ইংরেজ শাসকরাও বাংলার মাদ্রাসাগুলোতে অধ্যয়নের ব্যাপক ও ধারাবাহিক পদ্ধতি লক্ষ্য করেছেন। প্রদেশে শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের প্রতিবেদনে এডাম বলেছেন যে, আরবি বিদ্যালয়গুলোতে অত্যন্ত ব্যাপক ধরনের পাঠ্যতালিকা রয়েছে। এতে ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণ ব্যাকরণ গ্রন্থ, ছন্দের তালিকা, তর্কশাস্ত্র ও আইন এবং বাহ্যিক পর্যবেক্ষণসমূহের অধ্যয়ন এবং ইসলামের মূলনীতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল। জ্যামিতিশাস্ত্রের ওপর ইউক্লিডের এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপর টলেমীর গ্রন্থাবলী অনুদিত হয়ে, প্রাকৃতিক দর্শন ও সাধারণ দর্শনশাস্ত্রের ওপর নিবন্ধনসমূহের সঙ্গে একত্রে কোন কোন বিদ্যায়তনে ব্যবহৃত হতো।

টোলগুলোর অর্থাৎ সংস্কৃত বিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যতালিকার সঙ্গে মাদ্রাসাগুলোর পাঠ্যবিষয়ের তুলনা করে এডাম মন্তব্য করেন যে, সংস্কৃত বিদ্যালয় অপেক্ষা মাদ্রাসার শিক্ষার বিষয় অনেক বেশি ব্যাপক ও উদার প্রকৃতির ছিল এবং মুসলমানদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন।[১৪]

মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ের ব্যাপকতা ও উচ্চমানের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে জেনারেল স্লীম্যান লিখেছেন, সম্ভবত পৃথিবীতে খুব কম সম্প্রদায়ই রয়েছে যাদের মধ্যে ভারতের মোহামেডানদের অপেক্ষা অনেক বেশি শিক্ষা প্রসারিত হয়েছে। মুসলমানরা আরবি ও ফার্সি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করেন, যা আমাদের কলেজে যুবকরা সেই গ্রিক ও ল্যাটিন অর্থাৎ ব্যাকরণ, ছন্দ ও তর্কশাস্ত্রের মাধ্যমে শিক্ষা পেয়ে থাকে। সাত বছরকাল অধ্যয়নের পর একজন মুসলমান যুবক অক্সফোর্ড থেকে পাস করা একজন নব্য যুবকের মতোই জ্ঞানের প্রায় এই সকল শাখায় পূর্ণতা লাভ করে থাকে। সে অনর্গলভাবে সক্রেটিস এবং এরিস্টটল, প্লেটো ও হিপোক্রেটিস, গ্যালেন ও আভিসিনা (ইবনে সিনা) সম্বন্ধে আলোচনা চালাতে পারে।

উচ্চশিক্ষা পর্যালোচনা করতে গিয়ে এটা উল্লেখযোগ্য যে, এ উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের মতো বালাদেশের মাদ্রাসাসমূহে 'রসায়ন', 'গ্রিক' ও 'ইরানি' চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যয়ন করা হতো এবং এই শাস্ত্রমতে চিকিৎসা চালানো হতো। 'শরফনামা' গ্রন্থে আমির সাহাবুদ্দিন হাকিম কিরমানী নামক চতুর্দশ শতকের একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালি চিকিৎসকের উল্লেখ পাওয়া যায়। চিকিৎসাবিদ্যায় বিপুল খ্যাতি অর্জন করায় তিনি 'চিকিৎসকদের গৌরব' আখ্যায় আখ্যায়িত হয়েছেন। সুলতান জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ চিকিৎসাবিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। মীর্জা নাথনের সময়ে কবিরাজ শ্রেণির চিকিৎসক ছাড়াও, বহু চিকিৎসককে এই প্রদেশে চিকিৎসা ব্যবসায় নিয়োজিত দেখা যায়। মুহাম্মদ সাদিকের 'সুব-ই-সাদিক' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী মীর আলাউল মুলক চিকিৎসাবিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়াদিতে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন এবং উল্লিখিত গ্রন্থকারের সময়ে তিনি জাহাঙ্গীরনগরের অধিবাসী ছিলেন।[১৫]

নবাবদের আমলের বাংলার বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ হাকিম হাদী আলী খানকে চিকিৎসাবিদ্যা ও নিরাময়ের ক্ষেত্রে প্লেটো ও গ্যালেনের সঙ্গে তুলনা করেছেন গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈ। গ্রিক (ইউনানি) চিকিৎসাবিদ দার্শনিক প্লেটো ও গ্যালেনের সঙ্গে বাঙালি মুসলমান চিকিৎসাবিদের তুলনা থেকে প্রদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ইউনানি বিজ্ঞানের প্রভাব এবং এই পদ্ধতিতে এর চিকিৎসকদের দক্ষতার বিষয় অবগত হওয়া যায়।

সমসাময়িক ইউরোপীয়দের বর্ণনা থেকে মুসলমান চিকিৎসাবিদদের নৈপুণ্য ও জ্ঞান সম্বন্ধে একটা ধারনা লাভ করা যেতে পারে। ইউরোপীয় শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি সবরকম পক্ষপাত থাকা সত্ত্বেও এবং বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক কোলবার্টের শিষ্য ও নিজে ইউরোপের নতুন শিক্ষাপদ্ধতিতে ভালো চিকিৎসাবিদ হয়েও, বার্ণিয়ার এই উপমহাদেশের মুসলমান চিকিৎসাবিদদের জ্ঞান ও পদ্ধতির প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি সপ্তদশ শতকের মুসলমানদের চিকিৎসাবিদ্যার উচ্চ প্রশংসা করেন এবং শবব্যবচ্ছেদ বিদ্যায় হিন্দু চিকিৎসকদের অজ্ঞতার বিষয় উল্লেখ করেন। বার্ণিয়ার বলেন যে, মুসলমান চিকিৎসকগণ আভিসিনা (ইবনে সিনা) ও আভারোজের (ইবনে রুশদ) নিয়মাবলি অনুসরণ করেন এবং গ্যালেনের চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসারে স্ফীত স্থান থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্ত বের করে দেন এবং এভাবে প্রায় সূচনাতেই রোগ দমন করার জন্য রক্তক্ষরণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন। বার্ণিয়ারের মতে, যদিও মুসলিম চিকিৎসকেরা চিকিৎসাক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের নতুন নতুন আবিষ্কারের কথা জানতেন না, তথাপি প্রথম মুসলিম যুগের দার্শনিক ও চিকিৎসক ইবনে সিনা ও ইবনে রুশদ প্রদর্শিত পদ্ধতিতে রোগের চিকিৎসা ও নিরাময়ে তাঁরা যথেষ্ট সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন।[১৬] উইলিয়ম এডাম উনিশ শতকের প্রথম দিকেও বাংলার মাদ্রাসাগুলোতে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে দেখেছেন।

বাংলায় বৈদিক চিকিৎসাশাস্ত্র বেশ উন্নত ছিল। কবিরাজ বা বৈদ্য নামে অভিহিত হিন্দু চিকিৎসকগণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবচ্ছেদ অমানুষিক মনে করতেন এবং এজন্য তারা অস্ত্রোপচার পরিহার করতেন। অন্যদিকে, রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে তারা উল্লেখযোগ্য দক্ষতা প্রদর্শন করেন। বাংলায় সুলতানি শাসনামলে, বৈদ্যদের কেউ কেউ বারবক শাহ ও হোসেন শাহের দরবারে রাজ-বৈদ্যের মর্যাদায় উন্নীত হন। মির্জা নাথন হিন্দু বৈদ্যদের লতা-পাতা দিয়ে চিকিৎসার প্রশংসা করেন। বার্ণিয়ার মন্তব্যচ্ছলে বলেন যে, হিন্দুস্থানে বৈদ্যদের এ ধরনের চিকিৎসা সফল হয় এবং শবব্যবচ্ছেদে অজ্ঞতা সত্ত্বেও চিকিৎসকগণ নিশ্চিত করে বলতেন যে, মানবদেহে শিরা-উপশিরার সংখ্যা পাঁচ হাজার এর বেশিও নয় এবং কমও নয়; মনে হয় যেন তারা এগুলো খুব সতর্কতার সঙ্গে গণনা করেছেন।

মাদ্রাসাগুলোতে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তবে মুসলিম শাসনামলের প্রথমদিকে এই উপমহাদেশে জ্যোতির্বিদ্যা খুব বেশি পঠিত হত না। কিন্তু সম্রাট আকবরের সময় থেকে জ্যোতির্বিদ্যা অনুশীলন মুসলমানদের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। সম্রাট আকবর মুসলমান ও হিন্দু পণ্ডিতদের সহায়তায় হিন্দুদের জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থাবলী সংস্কৃত থেকে ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেন। বাংলার মুসলমান পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে জ্যোতির্বিদ্যায়

খ্যাতি অর্জন করেন। গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈ নবাব আলীবর্দির দরবারের অন্যতম পণ্ডিত মুহম্মদ হাজীনকে সে যুগের একজন খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদরূপে উল্লেখ করেছেন।[১৭]

মধ্যযুগে টোলে শিক্ষা (সংস্কৃত শিক্ষা)

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর হিন্দু বালকগণ, যারা উচ্চ শিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা করতো, তারা সাধারণত টোলে প্রবেশ করতো। এই সমস্ত টোল ছিল সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ছাত্রদেরকে টোলে শিক্ষা দেয়া হতো। অর্থ ও প্রতিপত্তির সাহায্যে কখনও ধনী বণিকগণ সেখানে তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারতেন। কোন কোন টোলে বাংলা এবং ফারসিও শেখানো হতো। ছয় শাস্ত্র-কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষশাস্ত্র, ছন্দ, নিরুক্ত (বৈদিক অভিধান বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ) ও দর্শন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে পরিগণিত ছিল। ইতিহাস অনুশীলনও পাঠ্য-তালিকায় প্রবর্তিত হয়েছিল। কালীদাসের গ্রন্থাবলী, বিজয় রক্ষিতের চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থের টীকা (মধুকোষ), অমর কোষ (অমর সিংহের বিশ্বকোষ), পাণিনির ব্যাকরণের টীকা এবং রামায়ণ ও মহাভারত সংস্কৃত বিদ্যালয়ে প্রধান পাঠ্য বিষয় ছিল।[১৮]

মধ্যযুগে বাংলায় কয়েকটি সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র বিদ্যমান ছিল। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ। প্রাচীন যুগে এটা ছিল শিক্ষার একটি কেন্দ্র। মুসলমান শাসনামলে এটি দর্শনের নব্যকেন্দ্রে (নব্যন্যায়) উন্নীত হয় এবং উপমহাদেশের সব অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীদেরকে আকৃষ্ট করে। কোন কোন পণ্ডিত এটাকে সে যুগের অক্সফোর্ডের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এর খ্যাতির কথা উল্লেখ করে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবদ্বীপে বহু টোল বিদ্যমান ছিল এবং আরো ছিলেন হাজার হাজার খ্যাতনামা পণ্ডিত, বিদ্বান ব্যক্তি ও অধ্যাপকবৃন্দ, যারা সেকালের সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন।[১৯] সংস্কৃত শিক্ষার প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হিসেবে নবদ্বীপ তার গৌরবময় ঐতিহ্য সমগ্র মুসলমান শাসনামলব্যাপী বজায় রেখেছিল।

বাংলার নবাবী আমলে নবদ্বীপ কেন্দ্র নদীয়ার জমিদার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উদার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। তাঁর দরবার জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী একদল পণ্ডিতের সমাগমে মুখর ছিল। বিখ্যাত জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ ও 'সার সংগ্রহের' গ্রন্থকার রামরুদ্র এবং সুপরিচিত কবি ভারতচন্দ্র মহারাজা রামকৃষ্ণের দরবার অলংকৃত করেছিলেন এবং তাঁরা মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।

বরিশাল জেলার কবি বিজয়গুপ্তের বসতগ্রাম 'ফুল্লশ্রী' ষোড়শ শতকে হিন্দু শিক্ষা-সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল। বিজয়গুপ্ত তাঁর 'পদ্মপূরাণে' বলেন, ফুল্লশ্রীতে ব্রাহ্মণদের বসতি ছিল; তারা চার বেদ ও নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং চিকিৎসাবিদ্যায় তাদের বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। কায়স্থগণ লেখার কাজে দক্ষ ছিল এবং অন্যান্য লোকেরা তাদের নিজ নিজ পেশায় চতুর ছিল।

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় যে, সাতগাঁও ছিল অন্য একটি সংস্কৃতি শিক্ষার কেন্দ্র। বিপ্রদাসের মতে, পঞ্চদশ শতকে সপ্তগ্রামে বহু হিন্দু যোগী ও সন্ন্যাসীর আশ্রম ছিল

এবং পারদর্শী বহু পণ্ডিত সেস্থানে বসবাস করতেন। হিন্দু শিক্ষার অন্যান্য কেন্দ্র ছিল, যেমন-সিলেট, চট্টগ্রাম ও বিষ্ণপুর (বাকুড়া জেলা)।

মুসলমান শাসনকর্তাগণ সংস্কৃত শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেন ও কয়েকজন মুসলমান সংস্কৃত ভাষা শেখেন এবং এমন কি এই ভাষায় তারা গ্রন্থও রচনা করেন। এভাবে মুসলিম রাষ্ট্রের উদার ও নৈতিক ও বিদ্যাগত পরিবেশে সংস্কৃত শিক্ষার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। রাষ্ট্র অথবা জমিদার ও অবস্থাপন্ন লোকদের প্রদত্ত ভূমির আয় থেকে টোলের গুরু তার ভরণপোষণ করতেন। কিন্তু তিনি ছাত্রদের কাছ থেকে কোন বেতন আদায় করতেন না। কিন্তু ছাত্ররা তার কাজকর্মে সাহায্য করত এবং টোলের শিক্ষাজীবন সমাপনান্তে তারা গুরুকে দান-দক্ষিণা উপহার দিয়া তার আশীর্বাদ গ্রহণ করতো।

হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এদের মধ্যে চিকিৎসাবিদ্যা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মণদের একশ্রেণি চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুশীলন ও রোগ-নিরাময় কৌশল আয়ত্ত করতেন। তাদেরকে 'বৈদ্য' (উত্তর ভারতের বৈদ্য) বা কবিরাজ (চিকিৎসক) বলা হতো। ষোড়শ শতকের হিন্দু কবি দ্বিজ হরিরামের বর্ণনা থেকে তাদের চিকিৎসা সম্পর্কিত দক্ষতা সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। এ যুগের বৈদ্য বা কবিরাজগণ সুনিপুণ চিকিৎসক ছিলেন। মীর্জা নাথন লিখেছেন যে, তার পিতার গুরুতর পীড়ায় কোন মুসলমান চিকিৎসকই তাকে নিরাময় করতে সক্ষম হননি। অবশেষে জনৈক কবিরাজ কিছু বনজ ঔষধি প্রয়োগে চিকিৎসা করে তাকে নিরাময় করেন।[২০]

চিকিৎসাবিদ্যা ব্যতিত জ্যোতিষশাস্ত্র ও ফলিত জ্যোতিষবিদ্যার চর্চা এক শ্রেণির ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এদেরকে দৈবজ্ঞ বলা হতো। কবি দ্বিজ হরিরামের বর্ণনায় এই দৈবজ্ঞদের জীবন চিত্রিত হয়েছে।

মধ্যযুগে হিন্দুদের শিক্ষা

মুসলমানদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষার প্রতি হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত হয়। প্রাক-মুসলমান যুগে বাংলাদেশে শিক্ষা প্রধানত ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং যে কোন প্রকার জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণগণ তাদের শাস্ত্রজ্ঞানের চর্চায় একচ্ছত্র অধিপত্য বজায় রাখতেন। সুতরাং শ্রী চৈতন্য যখন সকল শ্রেণির সাম্য ও সকলের জন্য সমান সুযোগ অবারিত ঘোষণা করলেন, ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণব গুরুর প্রতি খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং মুসলমান শাসকের নিকট চৈতন্যের বিরুদ্ধে নালিশ জানালেন। তারা শ্রী চৈতন্যের প্রচারিত মতবাদ ধর্মবিরোধী বলে আখ্যায়িত করে বলেন "চৈতন্য প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদীদের উত্তেজিত করে হিন্দুধর্মের সর্বনাশ করছেন। নিম্ন শ্রেণির লোকেরা কৃষ্ণের নাম সংকীর্তন করছে। এ পাপ (অধর্মের কাজ) নবদ্বীপের সর্বনাশ করবে।"[২১]

মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে অবহেলিত হিন্দুরা সুবিধাভোগী হিন্দু শ্রেণির কবল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করার সুযোগ লাভ করে এবং চিরকালের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে। বাংলাদেশে নিম্ন শ্রেণির হিন্দুরা মুসলমান শাসনের

সূচনা থেকেই শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন শুরু করে। জনৈক হিন্দু কবির রচিত 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নামক কাব্য গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, মুসলমান শাসনামলে হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণির হরি ও শাহুরা (সাহা) দলিল-পত্র পড়া ও লেখার মতো যথেষ্ট শিক্ষিত ছিল।

হিন্দু বালক-বালিকাদেরকে পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা দান করা হতো এবং এসব পাঠশালা সাধারণত ধনী ব্যক্তিদের গৃহসংলগ্ন ছিল কিংবা গুরুগৃহের কোন বৃক্ষতলে অবস্থিত ছিল। ধনী হিন্দুরা এই সকল পাঠশালার রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। মনসামঙ্গল কাব্যের কবি বিজয়গুপ্ত বলেন যে, চাঁদ সওদাগর একটি বৃহৎ পাঠশালার ব্যয়ভার বহন করতেন এবং সেখানে সোমাই পণ্ডিত নামে গুরুর নিকট তার ছয় পুত্র শিক্ষা গ্রহণ করে।

মুসলমানদের মত প্রাথমিক পর্যায়ে হিন্দু বালক-বালিকাদের মধ্যে সহশিক্ষা চালু ছিল। হিন্দু বালিকারাও পাঠশালায় অধ্যয়ন করতো। জনৈকা রাজকন্যা ময়নামতী তার পিতারগৃহ-সংলগ্ন পাঠশালায় গুরুর নিকট বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করে। সপ্তদশ শতকের বাংলা কাব্য 'সারদা মঙ্গলে' পাঠশালায় অধ্যয়নরতা পাঁচজন রাজকন্যার উল্লেখ রয়েছে; সেখানে বহু বালক ও একজন যুবরাজ শিক্ষালাভ করতেন।[২২] সাধারণ মেয়েরা যে লেখাপড়া জানতো এ রকম বহু দৃষ্টান্ত আছে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে যে, লীলাবতী নাম্নী এক রমণী ধনপতি নামে এক বণিকের স্ত্রী লহমার নিকট এমন একটি চাতুর্যপূর্ণ পত্র লিখেছিল যাতে লহমা মনে করেছিল যে, সে চিঠি তার স্বামী তাকে লিখেছে।

হিন্দু সমাজে উচ্চশিক্ষিতা রমণীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কবি চণ্ডীদাসের প্রেয়সী ধোপা-রমণী রামী বাংলায় পদাবলী রচনা করেন। চৈতন্যের শিষ্যা মাধবী সুশিক্ষিতা ছিলেন। তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেন। কবি বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিভাসম্পন্না কবি ছিলেন। খনা একজন গুণবতী রমণী ছিলেন তার জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত বিজ্ঞ মন্তব্যগুলো বাংলার গৃহ-প্রবাদে পরিণত হয়েছে।[২৩] তিনি মুসলমান শাসনের প্রথম যুগে এই প্রদেশে বসবাস করতেন। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে অনেক বিদ্যাবতী রমণীর বিষয় বর্ণিত হয়েছে। নাটোরের রাণীভবাণী ছিলেন একজন সুশিক্ষিতা মহিলা। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজদরবারের বিখ্যাত ভাঁড় রসরাজের কন্যা সাহিত্য বিষয়ে পারদর্শিনী ছিলেন। সে যুগের ভিক্ষোপজীবিনী সাধু রমণীরাও বেশ শিক্ষিত ছিলেন।

ছ'বছরের বেশি সময় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হতো। কৃত্তিবাসের রামায়ণ থেকে জানা যায় যে, কবি এগার বছর বয়সে তার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং বার বছর বয়সকালে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য গমন করেন।

মধ্যযুগে নারীশিক্ষা

মুসলমানগণ তাদের মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। যাতে বালিকারা তাদের ধর্মের মূলনীতি, কোরআন পাঠ ও ধর্মের ক্রিয়া-কর্ম সঠিকভাবে পালন করতে পারে, সে জন্যে পিতা কন্যাদের শিক্ষিত করে তোলা ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন। বালিকাদের ও বালকদের 'বিসমিল্লাখানি' অনুষ্ঠান দ্বারা অক্ষর পরিচয় শুরু হতো এবং তারা একই মক্তবে বালকদের সঙ্গে একত্রে পড়াশুনা করতো। এডামের রিপোর্টে একই প্রাথমিক

বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণ করার প্রমাণ মেলে। এ থেকে এই ধারণা জন্মায় যে, স্ত্রীশিক্ষা প্রাথমিক পর্যায়ের একটা বিশেষ স্তর পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

সমাজে পর্দা প্রথার ফলে মেয়েদের প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। মাধ্যমিক পর্যায়ে সহশিক্ষা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। মেয়েদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ প্রকৃতপক্ষে উচ্চশ্রেণি ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল-বিশেষত, যারা এর জন্যে ব্যবস্থা করতে সক্ষম ছিলেন। সম্রাট আকবর ফতেহপুর সিক্রিতে তাঁর প্রাসাদে রাজ পরিবার ও অভিজাত শ্রেণির মেয়েদের জন্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।[২৪]

শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান বাঙালি সুলতানগণ, সুবাদার, নবাব এবং অভিজাত মহল তাদের কন্যাদের শিক্ষার নিমিত্ত গৃহ-শিক্ষয়িত্রী রাখার মুসলিম ঐতিহ্য অনুসরণ করেন। উইলিয়ম এডাম পাণ্ডুয়ার ধনী ব্যক্তিগণ কর্তৃক তাদের পুত্র-কন্যাদের শিক্ষার জন্য গৃহ-শিক্ষক রাখার রীতি লক্ষ্য করেছেন।[২৫] কার্যত এই রীতি বাংলায় মুসলিম শাসনামলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত রীতিরই অব্যাহত ধারা ছিল। এডাম মন্তব্য করেন যে, প্রতিবেশী গরীব পরিবারের ছেলেমেয়েরা সে যুগের অবস্থাপন্ন মুসলমানগণ কর্তৃক নিযুক্ত গৃহ-শিক্ষকদের নিকট শিক্ষালাভ করতে পারতো। এভাবে মুসলমান বালিকারা গৃহে গৃহশিক্ষক কিংবা গৃহ-শিক্ষয়িত্রীর নিকট বিদ্যার্জনের সুযোগ পেতো। যেহেতু এই বিশেষ ব্যবস্থা অবস্থাপন্ন ধনী মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারিণী বালিকাদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত।

সমসাময়িক বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, বাংলাদেশের উচ্চ সম্প্রদায়ের মহিলারা অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিতা ও সংস্কৃতিসম্পন্না ছিলেন। বাংলার সুবাদার, নবাবগণ এবং তাদের আমির-ওমরাহ্ ছিলেন অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন। এটা স্বাভাবিক যে, তারা তাদের কন্যাদের উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত করতেন। মহিলাদের কেউ কেউ তাদের শিক্ষা ও প্রতিভার গুণে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রভাব প্রতিপত্তি স্থাপন করেন এবং সে কালের ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেন। বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খান ফতেহজঙ্গের স্ত্রী রোকেয়া বেগম তাঁর বিদ্যাবত্তা ও গুণরাজির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। নবাব শায়েস্তা খানের কন্যারা অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিতা ও সংস্কৃতিসম্পন্না ছিলেন। কিংবদন্তী অনুসারে পরীবিবি সে যুগের একজন গুণান্বিতা মহিলা ছিলেন।[২৬] মুর্শিদকুলী খানের কন্যা ও নবাব সুজাউদ্দিনের স্ত্রী জিনাতুননিসা বেগম ছিলেন এরকম একজন প্রতিভাময়ী ও সংস্কৃতিসম্পন্না মহিলা যার প্রভাব তদীয় স্বামীর প্রশাসন কার্যে অনুভূত হতো।

সে যুগের উচ্চশিক্ষিতা ও প্রতিভাশালিনী মহিলাদের মধ্যে আলিবর্দী খানের বেগম শরফুননিসার নাম সর্বাগ্রগণ্য। সমসাময়িক পারস্য দেশীয় ও ইউরোপীয় লেখকগণ তার সুরুচি, সুশিক্ষা ও উদার ব্যবহারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আলিবর্দীর কন্যা ঘষেটি বেগম, মায়মুনা বেগম ও আমিনা বেগম এরা সকলেই সুশিক্ষিতা ছিলেন। এইসব মহিলাদের জীবন থেকে প্রমাণ হয় যে, উচ্চশ্রেণির রমণীরা শিক্ষার সুযোগ পেতেন এবং শিক্ষা ও প্রতিভার বলে তারা ইতিহাসের আলোকে আসতে সমর্থ হতেন। উচ্চশিক্ষার ফলে মুসলমান মহিলাদের প্রতিভা প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছিল। শিক্ষা তাদেরকে সাহস ও মানসিক শক্তি

সম্পদে বিভূষিত করে। এভাবে দেখা যায় যে, সেকালের মুসলমান সমাজে অনেক সুশিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্না মহিলা ছিলেন যারা বুদ্ধিবৃত্তি এবং গূঢ়তাত্ত্বিক অন্বেষায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা

শিক্ষকরা সমাজে সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ গ্রামের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন। পিতামাতা মৌলভী অথবা গুরুর নিকট তাদের ছেলে-মেয়েদের পৌঁছে দিয়ে নিজেরা সন্তান-সন্ততির শিক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন। দৌলত উজীর বাহরাম খানের কাব্যগ্রন্থ 'লায়লী মজনুতে' এ মনোভাবই পরিস্ফূট হয়েছে। শিক্ষকের প্রতি ছাত্রদেরও গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। ছাত্ররা পরম ভক্তির সঙ্গে গুরুর সেবা করতো। রাজ সরকার ও সমাজ কর্তৃক শিক্ষকদেরকে প্রচুর পরিমাণ সম্মানী দেয়া হতো। মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরকে লাখেরাজ সম্পত্তি ও বৃত্তিদানের ব্যবস্থা ছিল। রাষ্ট্র ও অবস্থাপন্ন মুসলমান কর্তৃক প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে মঞ্জুরি দেয়া হতো। আজকের দিনের শিক্ষকদের চেয়ে সে-যুগের মক্তব বা পাঠশালার শিক্ষকদের অবস্থা অনেক বেশি সচ্ছল ছিল।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাঁর ছাত্রদেরকে শিক্ষিত করে তোলার জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতেন। অনিয়মিত উপস্থিতি, পাঠে অমনোযোগ, পড়া তৈরি করতে না পারা, বেয়াদবী ও দুষ্টামীর জন্যে ছাত্রদেরকে নানা ধরনের শারীরিক শাস্তি দেয়া হতো। সপ্তদশ শতকের কবি দয়াময় বলেন, "যদি কোন ছাত্র তার পড়া শিখতে অপারগ হতো, তাহলে গুরু তাকে একগাছি দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতেন ও তার বুকের ওপর চড়ে বসতেন। অনিয়মিত ও দুষ্ট ছাত্রদের জন্য বেত্রাঘাত ও অন্যান্য প্রকারের শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। বাস্তবিকই মক্তব ও পাঠশালায় শাস্তিটা অত্যন্ত কঠোর ছিল এবং বেত মারা না হলে ছেলে খারাপ হয়, শিক্ষক এই প্রবাদটি অনুসরণ করে চলতেন। এডাম ১৮৩৫-৩৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রিপোর্টে বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রচলিত নানা ধরনের শাস্তির বর্ণনা করেছেন।[২৭]

মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থার মূল্যায়ন

প্রাক-মুসলমান যুগের বাংলার কোন ইতিহাস ছিল না এবং হিন্দুদের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অনুশীলনের জন্য কোন আগ্রহও পরিলক্ষিত হয় নি। বাংলা তথা উপমহাদেশের শিক্ষা ও জ্ঞান গরিমার ক্ষেত্রে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল ইতিহাস লিখন রীতির প্রবর্তন। বাঙালি হিন্দুগণ ইতিহাস লিখনের কৌশল জানতেন না। মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে মুসলমানগণ ইতিহাস লিখন ও অনুশীলন শুরু করেন এবং কালক্রমে হিন্দুদেরকে প্রভাবিত করেন। মুসলমানগণ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও উপাদান আমদানি করেন যার ফলে বাংলার জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তারা লেখার উপাদান হিসেবে কাগজের প্রবর্তন করেন। বাঙালি জনসাধারণ গ্রন্থ নকলকরণের মাধ্যমে পুস্তক বিতরণ-রীতির জন্যও মুসলমানদের নিকট ঋণী।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের মহৎ কার্যাবলীর প্রশংসা করে স্যার যদুনাথ সরকার বলেন "পুস্তক-বিতরণ এবং নকলকরণের দ্বারা জ্ঞান-বিস্তার রীতির জন্য আমরা মুসলমানদের নিকট ঋণী। অথচ সাধারণ রীতি হিসেবে প্রাথমিক যুগের হিন্দু লেখকগণ তাদের রচনাবলী গোপন রাখতে ভালবাসতেন"।[২৮] এটাও মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য অবদান যে, তারা শিক্ষাক্ষেত্রে উদারনৈতিক শক্তির প্রবর্তন করেন- যা হিন্দু সমাজের শিক্ষাব্যবস্থায়এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করে। শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার খর্ব হয়ে যায় এবং নিম্নশ্রেণির জনসাধারণ শিক্ষা ও জীবনের উন্নতির সুযোগ লাভ করে। অধিকন্তু মুসলমানগণ তাদের পৃষ্ঠপোষকতা, আরবি ও ফারসি সাহিত্যের বিপুল বিষয়বস্তুর সম্পদ শব্দকোষ ইত্যাদির দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমোন্নতি ও অগ্রগতিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে যান। এ প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য যে, ফারসি ভাষা ও মুসলিম সংস্কৃতি বাংলার জনসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন প্রভাবিত করে। হিন্দুদের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওপর এর প্রভাব এত ব্যাপক ছিল যে, ব্রিটিশ শাসনামলে বহু হিন্দু যেমন ইংরেজি কায়দা গ্রহণ করেছিল, ঠিক তেমনিভাবে তারা ভাষা, সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও শিষ্টাচারে পারস্যমুখী হয়ে পড়েছিল। মুসলিম সংস্কৃতিরই এই প্রভাব, এমন কি বাংলার মুসলমান শাসন অন্তর্হিত হওয়ার দীর্ঘকাল পরেও হিন্দুদের মধ্যে তা প্রচলিত থাকে।

তবে একথা স্বীকার্য যে, মুসলমান আমলে বাংলায়, কিংবা উপমহাদেশে, সমসাময়িককালে ইউরোপীয় দেশসমূহে রেনেসাঁর পরে বিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি হয়েছিল সেরূপ কোনো প্রশংসনীয় অগ্রগতি হয়নি। আলোচ্য পর্বে কোনো উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী বা আবিষ্কার সংঘটিত হয়নি। আরব ও মধ্য এশিয়া থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ বিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞানই এই উপমহাদেশে শিক্ষার মান হিসেবে চালু ছিল। সে যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবশ্য একটি বিশিষ্ট দিক ছিল-এর ব্যাপক প্রসার। অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাংলার মুসলমানগণ আরব এবং মধ্য এশিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলন করতো। এ যুগে বহু সংখ্যক পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়, যারা তাদের ধর্মীয় ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জ্ঞান-সম্পদের জন্য খ্যাতিমান ছিলেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো সৃজনশীল কর্ম পরিলক্ষিত হয়নি। ধর্মীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবশ্য বাংলার মুসলমান পণ্ডিতগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন।

তথ্যসূচি:

---

1. S.M. Jaffar, Education in Muslim India, Delhi, 1972, p. 33
2. J.N. Sarkar, India Through the Ages, Calcutta, 1957, p. 10
3. Varendra Anchale Shikshar Patabhumi, an article by Amanullh Ahmed in Varendra Anchaler Itihash, Rajshahi, 1998, p. 1113
4. R. C. Majumder, Bangladesher Itihash, vol. I, Dacca, 1943, p. 218
5. Nihar Ranjan Roy, Bangalir Itihash (Adiparba), Calcutta, 1952, p. 390

6. N.N.Law, Promotion of Learning during Muhammedan Rule, London, 1916, p. XIX
7. K.M. Asraf, Life and Condition of the People of Hindustan, Delhi, 1959, p. 145
8. D.C. Sen (ed.),Shamsher Ghazir Puthi; D.C Sen, (Typical Selections from Old Bengali Literature, pt. II,) Calcutta, 1914, p. 1854. Shamsher Ghazi was a contemporary of Nawab Alivardi.
9. Ain-i-Akbari, I (Blochmann), Bibliothika, 1877, p. 288
10. M.A. Rahim, Social and Cultural History of Bengal, Vol. 1, Karachi, 1963, p. 194
11. W. Adam, Education Report (1835-38), Calcutta, 1911, pp. 6-7
12. Abdul Quader Badayuni, Muntakhab al-Twarikh, vol. III, p. 74 and vol. II; Bibliothika, 1868, p. 32
13. Blochmann, op. cit., p. 288
14. W. Adam, Second Report, Calcutta, 1916, pp. 26-27
15. Subhi-i-Sadiq and Lahori (II, p. 755) quoted by Dr. a. Halim in the Journal of the Pakistan Historical Society, 1953, pt. IV, p. 347
16. Bernier, Travels in Mughal Empire; A constants, London, 1891, pp. 338-39
17. Ain, I, op. cit. p. 110
18. T.C Dasgupta, Some Aspects of Society in Bengal, Calcutta, 1935, p. 177
19. Vrindavandas, Chaitanya Bhagavata, p. 11
20. Mirza Nathan (ed.) Baharistan, I Gauhati, p. 39
21. Krishna Das Kabiraj Chaitanya Charitamrita, (ed.) Subodhchandra Majumder, Calcutta, 1955, p. 125
22. D.C. Sen, Banga Sahitya Parichaya, II, Calcutta, 1911, p. 1388
23. T.C. Dasgupta, op. cit., p. 193
24. N. N Law, op. cit., p. 202
25. A.R. Mallick, Brithis Policy and Muslims in Bengal, Dacca, 1961, p. 151
26. A. H. Dani, Inscriptions of Bengl, Dacca, 1961, p. 71
27. W. Adam, Education Report (1835-38), Calcutta, 1911, p. 209 and pp.1-2
28. J. N. Sarkar, op. cit., p. 52.